Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-III, published on July 2023, Page No. 30 – 41
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

বিশ্লেষণের আলোকে জীবনানন্দের কবিতার মননধর্মী পর্যালোচনা

দীপা ঘোষ
ইমেইল : 1998ghoshdipa@gmail.com

Keyword
ভাষা ব্যবহারে, জীবনানন্দ, প্রকৃতির রূপচিত্র, বাস্তব সচেতন, আধুনিক যুগযন্ত্রণার কবি, মৃত্যু চেতনা, অস্তিতের সংকট, রঙের ব্যবহারে অনন্যতা।

Abstract
যে সকল শিল্পির সৃষ্ট মুকুরে আমরা আমাদের অন্তরাত্মার সঙ্গে বহিঃজগতের বা আমাদের মনের অন্ধকারময় দিক কিংবা সমাজের প্রতিচ্ছবি স্পষ্ট দেখতে পায় সেই সকল শিল্পীর শিল্পত্বের সাহচর্যে আমাদের মনের নানান দুয়ার খুলতে আরম্ভ করে, এবং সেই এক একটি দুয়ারে বিভিন্ন অনুভূতির চিঠি আসতে থাকে, সেই চিঠি পড়ে আমাদের বোধের জাগরণ ঘটে, ফলত আমরা ক্রমশ সৃষ্টির সকল দিককে সঠিক ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারি। তেমনই একজন বিশিষ্ট কবি শিল্পী জীবনানন্দ। যার লেখায় আমরা আমাদের চোখে দেখা, ছুঁয়ে দেখা জগতের পরিচয় যেমন পায় তেমনি না দেখা জিনিসের অনুভূতি পায়।

এক দিকে প্রকৃতি, অন্যদিকে সমাজ, সমাজের নানান অন্ধকারময় দিক। সব দিকেই তাঁর দৃষ্টি লক্ষ্য করতে পারি। জীবনের নানান অভিঘাতের কথা বলে তিনি যেমন আমাদের চক্ষুতে আলো সঞ্চার করেছেন তেমনি আধুনিক যুগযন্ত্রণার প্রতিচ্ছবি তাঁর লেখনিতে ফুটে উঠেছে। জীবনানন্দের কবিতায় মূলত রয়েছে এক গভীর বিস্ময়ের অনুভূতি, তাইতো তাঁর কবিতা পরে আমরা সেই বোধে আক্রান্ত হয়ে পরি, ভাবতে থাকি সকল মানুষের মাঝে থেকেও কেন একা হয়ে পড়ছি। মৃত্যুচেতনা, অন্ধকার, কালো রঙ, ধূসরতা তাঁর কবিতায় এক রহস্যের সৃষ্টি করেছে। একটু সচেতন হয়ে পরলেই আমরা বুঝতে পারি এ সকল তাঁর যুগযন্ত্রনা বা জীবনের নানান অভিঘাতে জর্জরিত অনুভূতির ফসল ।

'শিকার' কবিতায় তিনি যে সমাজের পরিচয় দিয়েছেন তা যেন আমাদের বর্তমান সময়েরই প্রতিচ্ছবি মনে করায়। এছাড়াও প্রকৃতির রূপ তিনি যে ভাবে দেখেছেন বা প্রকৃতি নিয়ে ভেবেছেন তা দেখে রীতিমতো আমাদের আশ্চর্য হতে হয়, এত গভীর ভাবনা তাঁর লেখনিতে প্রকাশ পেয়েছে তা আর অন্য কোথায় আমরা পায় না। বর্তমান যুগে দাঁড়িয়ে জীবনানন্দ আমাদের কাছে শান্তির আশ্রয়ের মতন। দুদণ্ড শান্তির যে আশ্রয় কবি তাঁর বনলতা সেনের কাছে পেয়েছিলেন, এই অস্থির জীবনে তাঁর কবিতাও আমাদের দুদণ্ড শান্তির আশ্রয় দেয়। প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ ধূলো মাটি: কাঁদা-জল সমস্ত কিছুকেই তিনি যেন গভীর ভাবে অনুভব করেছেন। উপমা, অলংকার ছন্দ চর্চায় ও তিনি বিশেষ প্রতিষ্ঠার সাক্ষর রেখেছেন। জীবনানন্দের কবিতায় রঙের ব্যবহার কবিতাগুলিতে এক সতেজতা এক বিশিষ্টতা বলা

ভালো জীবন্ত অনুভূতি দান করেছে। জীবনানন্দের লেখনিতে যে সকল দিকগুলি উন্মোচিত হয়েছে কিংবা তাঁর লেখার সঙ্গে তাঁর মনন জগতের যে মেলবন্ধন যে অনুভূতি রয়েছে এবং সমাজের নানান দিক নিয়ে তিনি যে ভাবে ভেবেছেন, দেখছেন, সে সকল , যে কতটা বাস্তব বলে প্রমাণ অনুভূতির পাত ছিঁড়ে এসেছে এবং জীবনানন্দের লেখনী যে বর্তমান সময়ে কতোটা প্রাসঙ্গিক সে সকল দিক গুলিই মূল প্রবন্ধে আলোচনা করতে চেয়েছি।

Discussion

কবি তাঁর কাব্যের মধ্য দিয়ে একটি সত্যের, প্রকাশ ঘটান অনেক কাব্যরসিক একথা বলে থাকেন তার কারণ আজকের এই বিজ্ঞানের যুগে দাঁড়িয়ে সত্যের আইডিয়াকে নিয়ে সকলের মনে এক ধরনের ভাবনা অঙ্কুরিত হয়েছে, এই যে ভাবনা তৈরি হল এই ভাব-এর মধ্যেই রস দান করে অনেক কবিরা কাব্য রচনা করেছেন। এই ভাব এবং রস দুইই সম্পূর্ণ তাঁর নিজেস্ব আঙ্গিকে সৃষ্টি কাজেই তা নতুন বৈকি।

সত্যের এমনই নতুন পন্থা আবিষ্কার করে, তার মধ্যে মগ্ন হয়ে যিনি কাব্যজগতে একটি আলোড়ন ফেলে নিজের ভাবসত্ত্বার সঙ্গে রসজগতের মেলবন্ধন ঘটালেন এবং সম্পূর্ণ একটি ভিন্ন জগৎ বলা ভালো ভিন্ন কাব্য পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে ফেলতেন নিজেস্ব স্বাক্ষর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কালের বুকে তিনি জীবনানন্দ। কবির প্রতিভা কোন বিষয় নিয়ে ভেবে কাব্য লিখবেন তার সীমা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়, কবির এই প্রতিভা অভিনব গুপ্ত যাকে 'অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষমাপ্রজ্ঞা' বলেছেন। অর্থাৎ, কবির এই প্রতিভা যে কোন লীলাময় জগৎ নিয়ে কথা বস্তুর সৃষ্টি করবেন এবং সেটিকে রসমণ্ডিত করে একটি আকার দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করবেন তা কারো পক্ষে বলা অসম্ভব, জীবনানন্দ সম্পর্কেও কথটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। বুদ্ধদেব বসু বলছেন জীবনানন্দ সম্পর্কে--

> "কী আনন্দ আমাদের, তাঁর কবিতা যখন একটির পর একটি পৌঁছাতে লাগলো, যেন অন্য এক জগতে প্রবেশ করলাম - এক সান্ধ্য, ধূসর আলোছায়ার অদ্ভূত সম্পাতে রহস্যময়, স্পর্শগন্ধময়, অতিসূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়চেতন জগৎ যেখানে পতঙ্গের নিশ্বাস পতনের শব্দটুকুও শোনা যায়, মাছের পাখনার ক্ষীনতম স্পন্দনে কল্পনার গভীর জল আন্দোলিত হয়ে ওঠে। এই চরিত্রবান নতুন কবিকে অভিনন্দন জানিয়ে ধন্য হলাম আমরা।"[১]

জীবনানন্দ বাঙলা কাব্যসাহিত্যে একটি বিচিত্র ধারা আবিষ্কার করেছেন বলে আমাদের মনে হয়, তাঁর কবিতাকে অনেকেই দুর্বোধ্য মনে করেন এবং সেজন্য অনেকেই বিমুখ, কিন্তু তাঁর কবিতা পরে রস উপভোগ করার জন্য আমাদের সহৃদয় পাঠক হতে হবে, তবেই তাঁর কবিতার রসবোধের উৎসে প্রবেশ করা যাবে, যিনি একবার জীবনানন্দে নিজেকে জড়িয়ে তুলতে পেরেছেন তার কাছে জীবনানন্দ আধুনিকতার অন্যতম পথিকৃৎ। জীবনানন্দ এখনকার সময়ে দাঁড়িয়ে আমাদের কাছে শান্তির আশ্রয়ের মতো। তিনি 'বনলতা সেন' কবিতায় বনলতার কাছে যে শান্তি পেয়েছিলেন, আমরাও তাঁর কবিতা পরে দুদণ্ড শান্তি পায়। কবিতাগুলি পড়ে যেন মনে হয় এ যেন আমারই কথা, আমাদের বাস্তব সমাজ, পারিপার্শ্বিক দিকই তুলে ধরেছেন।

এমনই হয়তো হয় যাঁরা প্রতিভাধর করি হন তাদের লেখা, যা্রা চিরন্তন, চিরকালের হৃদয়গ্রাহী; রসপিপাসু পাঠকের অন্তরকে স্পর্শ করে এক মণিময় রসের আনন্দ ধারাকে অঙ্কুরিত করে তোলেন, এখানেই সেইসব কবির শ্রেষ্ঠত্ব, তেমনই শ্রেষ্ঠ একজন কবি, অদ্বিতীয় জীবনানন্দ। জীবনানন্দ নিজেই জানাচ্ছেন -

> "আজকের বৈজ্ঞানিক যুগে আমরা প্রেরণা" শব্দটির দিকে আড়চোখে তাকাই। শব্দটির ঢের অপব্যবহার হয়েছে। কিন্তু তবুও এর নিজস্ব পরিপ্রেক্ষিতে শব্দটির শুদ্ধতা ও সঙ্গতি নষ্ট হবার নয়। নিছক বুদ্ধির জোরে কবিতা লেখা সম্ভব নয়-- আরও অনেক কিছুর প্রয়োজন- এবং সে সবের সম্মিলিত-শৃঙ্খলের থেকেই প্রেরণার জন্ম হয়।"[২]

সেই অনেক কিছুর ব্যবহার আমরা জীবনানন্দের কবিতায় পায় তা বলবার অপেক্ষা রাখে না।

জীবনের নানা অভিঘাতে জর্জরিত থেকেও তিনি আমাদের এক মায়াময় রহস্যের জগতে নিয়ে যান, যে রহস্য আমরা হইতো আমাদের অচেতন মনে অনুভব করে থাকব, সেই-ই অচেতন রহস্যলোকে তিনি চেতন মনে পৌঁছে দেন আমাদের।

তাঁর ছন্দের মধ্যে চঞ্চলতা, বা জলস্রোতের মত তাড়াহুড়া নেই, এ যেন থেমে থেমে অনেক অনেক ড্যাশ ও কমার ঠোকা খেয়ে খেয়ে নিলিপ্ত নির্বিকার মন্থর গতিতে চলছে। এতে আছে একটা অবসাদ আছে ক্লান্তি, কিন্তু সেই অবসাদে সেই ক্লান্তিতে যেন একটি লোভনীয় মাধুরতা আছে, যেন মনে হয় আমাদের কতদিনের চেনা, অথচ সম্পূর্ন নতুন। তাঁর কবিতার সুর যেন ধূপের ধোয়ার মতো একদিকে থেকে আর একদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং সুগন্ধও ছড়িয়ে এক স্বপ্নরাজ্যের সৃষ্টি করে।

মূল্যবোধের পরিচয়ও আমরা জীবনন্দের কবিতায় পেয়ে থাকি, যেমন তিনি একটি কবিতায় বলছেন –

"আকাশ ছড়ায়ে আছে নীল হয়ে আকাশে-আকাশে।"[৩]

আকাশের সীমাহীনতার পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি আকাশে শব্দটিকে দু'বার প্রকাশ করেছেন। একটি মাত্র লাইনেই এমন বড়ো কথাটিকে বলেছেন যা থেকে তাঁর মূল্যবোধের পরিচয় আমরা পাই বইকি।

তিনি তার কবিতার ভাষাকে সংস্কৃত সাহিত্যের ধারে কাঙালপনা না করে দেশীয় শব্দ দিয়েই তার মনের ভাব প্রকাশ করলেন, অনেকে তা মেনে নিতে না পারলেও আমার কাছে তা যেন বাস্তব ঘেঁষা মনে হয়েছে; কিছু কিছু শব্দ যে গুলো দেশীয় ভাষা ছাড়া যেন ঠিক মানায় না, তেমনই যেখানে যেমন দরকার তিনি ব্যবহার করেছেন ভাষা। এ ভাষাকে অনেক খাঁটি বাঙলা করে গড়ে তুলে ধরবার চেষ্টা করে ভাষাকে অনেক বেশি সহজ ও সাবলীল করে তুলেছেন যেমন -

বুদ্ধদেব বসুর একটি মন্তব্য এক্ষেত্রে তুলে ধরা যেতে পারে তিনি বলেন –

> "যে গম্ভির ভাবের কবিতায় দেশজ বিদেশী শব্দের এমন স্বচ্ছন্দ 'সংগত ও প্রচুর ব্যবহার জীবনানন্দর আগে অন্য কোন বাঙালি কবি করেননি।"[৪]

জীবনানন্দ ইন্দ্রিয়বোধের অনুগত্যে অতুলনীয় তাকে চেনাযার তাঁর কিছু ইন্দ্রিয়বোধের কবিতা যেমন- অবসরের গান, হাওয়ার রাত, ঘাস, বনলতাসেন, মৃত্যুর আগে।

জীবনান্দের 'বোধ' এবং 'আটবছর আগের একদিন' কবিতাকে যে একে অপরের পরিপূরক কবিতা বলা যেতে পারে, 'বোধ' কবিতায় কবি যেন তার মুদ্রাদোষে সকল কিছুর থেকে আলাদা হয়ে গেছেন। তিনি তাঁর সেই বিপন্ন বিস্ময়কে এড়াতে পারছেন না কিছুতেই তাই সেই 'বোধকে' কে এড়াতে পারছেন না তাই তিনি বলছেন -

"আলো অন্ধকারে যাই – মাথার ভিতরে
স্বপ্ন নয়, কোন এক বোধ কাজ করে;
---আমি তারে পারি না এড়াতে,
সে আমার হাত রাখে হাতে,
সব কাজ তুচ্ছ হয় – পণ্ড মনে হয়,
সর্ব চিন্তা – প্রার্থনার সকল সময়
শূন্যে মনে হয় ...।"[৫]

এই শূন্যে মনে হয় বলেই তিনি সহজ লোকের মতো চলতে পারছেন না। তিনি সেই বোধ কে উপেক্ষা করতে পারছেন না এর জন্য তিনি সকল লোকের মতো বীজ বুনে স্বাদ পাচ্ছেন না। মড়ার খুলির মত তাকে ধরে আছাড় মারতে চাইলেও সেই বোধ জীবন্ত মাথার মতো ঘুরছে তার মাথার, চোখের বুকের চারিপাশে ...কোন কাজ করে শান্তি নেই। সব জাইগাতেই সেই বোধ কবিকে অস্থির করে তুলছেন, তা তাই তিনি বলছেন -

> "সকল লোকের মাঝে বসে / আমার নিজের মুদ্রাদোষে আমি একা হতেছি আলাদা? / আমার চোখেই শুধু বাধা? আমার পথেই শুধু বাধা?"[৬]

আসলে এই বোধ হচ্ছে, জীবনানন্দের কবিপ্রতিভা। তাকে তিনি এড়াতে পারছেন না আর সেই জন্যই তার সকল কিছুতে বাঁধা মনে হচ্ছে তিনি সকলের থেকে একা হয়ে যাচ্ছেন সকলের মাঝে থেকেও। এজন্যেই হয়তো আমরা 'আট বছর আগের একদিন' কবিতায় দেখতে পাই সবকিছু থাকা সত্ত্বেও একজন মানুষের কেন মরবার সাধ হয়, বধূ, শিশু, প্রেম, আশা, জীবনে ভালো থাকবার সকল উপকরণ থাকা সত্ত্বেও তার মরবার সাধ হয়। এই সাধ বোধ হয় সেই 'বোধে'র থেকে উৎপন্ন বিপন্ন বিস্ময় থেকেই। তাইতো সেই মানুষটির সব থাকা সত্ত্বেও এক গাছা দড়ি হাতে করে একা একা অশ্বত্থ গাছের দিকে এগোয়। জীবনের সমস্ত স্বাদ সুপক্ক যবের ঘ্রাণ হেমন্তের বিকোলের সব অসহ্য বোধ হয় বলেই মর্গে খ্যাতা ইঁদুরের মতো রক্তমাখা ঠোঁটে পড়ে থাকতে দেখা যায়, কবি তাই বলছেন -

> "জানি-তবু জানি
> নারীর হৃদয় - প্রেম - শিশু – গৃহ নয় সবখানি;
> অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয় –
> আরো এক বিপন্ন বিস্ময়
> আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
> খেলা করে।"[৭]

যা আমাদের ক্লান্ত করে। আর লাস কাটা ঘরে সেই ক্লান্তি নেই এজন্যে সেই বিপন্ন বিস্ময় থেকে নিস্তার পেতে তার বেঁছে নিতে হয় এক গাছা দড়ি। কবির ভাষায় -

> "চাঁদ ডুবে গেলে পর প্রধান আঁধারে তুমি অশ্বত্থের কাছে
> এক গাছা দড়ি হাতে গিয়েছিলে একা একা;
> যে জীবন ফড়িঙের, দোয়েলের - মানুষের সাথে তার হয় নাকো দেখা
> এই জেনে।"[৮]

বুদ্ধদেব সু বলছেন জীবনানন্দ সম্পর্কের -

> "তাঁর কাব্যে গদ্য ভাষা এমনভাবে নিবিষ্ট হয়েছিল যে রীতিমতো বিপজ্জনক শব্দও তাঁর আদেশে বিশ্বস্ত ভৃত্যের মতো কাজ করে গেছে।"[৯]

আমার মতো কেউ নাই আর – একথার পুরোটিই যেন তার পক্ষেই সত্য, আজকের পাঠক হয়ে আমাদের আজ আর বুঝাতে বাকি থাকে না। তাকে যেন বাংলা কাব্যের মধ্যে একটি সন্ধ্যা তারার মতো মনে হয়, যে সকলের থেকে আলাদা।

নজরুল ইসলামের প্রভাবের কথা বাদ দিলে মহাভারত থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কোনো ধারাকেই তিনি নিজেকে জড়াতে চাননি বলা ভুল হবে, তাঁর জড়ানোর প্রয়োজন বোধ হয়নি বললেই ভালো হয়, বুদ্ধদেব বসুর ভাষায় তাই বলতে হয় --

> "তিনি বাংলা কাব্যের ঐতিহাসেরতের মধ্যে একটি

মায়াবী দ্বীপের মতো বিচ্ছিন্ন ও উজ্জ্বল;"[১০]

তার কাব্যরীতি কালীপ্রসন্ন সিংহের কিংবা অবনীন্দ্রনাথের গদ্যের মতো, অথবা শরৎচন্দ্রের ছোটগল্পের মতো একেবারেই তাঁর ব্যক্তিত্বের স্বাক্ষরে উজ্জ্বল এক পথরেখা তিনি নিজেই। সেই পথরেখা অন্য কোন কবির পক্ষে অঙ্কন করা বা অনুশীলন করা কষ্টসাধ্য বলা ভালো কঠিন। তিনি বাংলা কাব্যের সত্যিকারের আধুনিকতার প্রতিভূ একথা অনেকে মানতে কুণ্ঠাবোধ করলেও এটিই সত্য যে তিনি খাঁটি আধুনিক। বুদ্ধদেব বসুর সুরে তাই আমরাও বলতে পারি-

"তিনি যুগের সঞ্চিত পণ্যের অগ্নিপরিধির মধ্যে দাঁড়িয়ে।
যিনি দেবদারু গাছে, কিন্নড় কণ্ঠ শুনে ছিলেন, তিনি এই
উৎভ্রান্ত, বিশৃঙ্খল যুগে ধ্যানী কবির উদাহরণ স্বরুপ।"[১১]

জীবনানন্দের কাব্যে প্রকৃতির এক উল্লেখযোগ্য অস্তিত্ব রয়েছে। কখনো প্রকৃতি কবিতার বিষয়। কখনো কবিতার পটভূমি আবার কখনো তো ক্লান্ত কবির শেষ আশ্রয়ভূমি। প্রকৃতির এহেন বিচিত্র রূপ নির্মল আকাশের মতো তুলে ধরেছেন জীবনানন্দ তাঁর কবিতায়। প্রকৃতির এক মায়াবী রূপ যে রয়েছে সেই রূপের বিচিত্রতা আমরা জীবনানন্দকে পাঠ করলে সেই রূপের পরিচয়ে আনন্দ পেতে পারি।

তার ঝরাপালক, ধূসর পাণ্ডুলিপি (১৯৩৬) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের মূল (3529) অবস্থান প্রকৃতি। তার কাব্যের যে প্রকৃতির ছবি আমরা পাই তা শুধু -চিত্ররূপকে ও প্রকাশ করে না। তা আমাদের নির্জন আশ্রয়ের মতন।

এসব কবিতায় কখনো কুয়াশা আর হিমে ঝরা পাতার ভিড়, কখনো সন্ধ্যার মেঘের রঙকে তুলে ধরছেন, কখনো হেমন্তের বিষাদ তার রূপসী বাংলায় গ্রাম বাংলার ছবি দেখতে পাই, যা আমাদের শান্তির নীড়ের মতো হৃদয়কে শান্ত করে, সেখানে আমাদের চোখে পড়ে কচি লেবু পাতার মতো নরম সবুজ আলো, কাঁচা বাতাবির মতো সবুজ ঘাস, শালিখের খয়েরি ডানা, ভিজে মাটির গন্ধ, তমালের নীল ছায়া প্রভৃতি আমরা অনুভব করি তার কবিতায়। প্রকৃতির সঙ্গে জীবনানন্দ এতই আত্মময়তা সৃষ্টি হয়েছিল তাই তো তিনি বলতে পেরেছিলেন-

"বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি। তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর।"[১২]

প্রকৃতির রূপই কবিকে অভিভূত করেনি। প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যেও তিনি ডুব দিয়েছেন তাইতো তিনি কবিতায় বলছেন 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি' কবিতায় -

"অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে / চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড়ো পাতাটির নিচে বসে আছে ভোরের দোয়েল পাখি।"[১৩]

প্রকৃতির রূপের প্রেমে কবি জীবনানন্দ, এত শান্তি, মধুরতা কোমলতা পেয়েছেন মায়ের আঁচলের স্পর্শের মতো স্নেহ অনুভব করেছেন যে এই প্রকৃতির মাঝে তিনি বার বার জন্ম নিতে চান যে কোন রূপে তাই তিনি ফিরে আসার আর্তি জানিয়ে বলছেন- আবার আসিব ফিরে' কবিতায় -

"আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে- এই বাংলার হয়তো মানুষ নয়, হয়তো বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে।"[১৪]

বুদ্ধদেব বসুর ভাষায় তাই বলতে পারি-

"আমাদের আধুনিক কবিদের মধ্যে একজনকে এই বিশেষ অর্থে প্রকৃতির কবি বলা যায়, তিনি জীবনানন্দ দাশ।"[১৫]

জীবনানন্দ কবিতা লেখার মূলবস্তু হিসেবে কল্পনাবোধকেই মেনে নিয়েছিলেন। আর এই কল্পনা প্রতিভায় তিনি ছিলেন বিশেষ ভাবলোকের অধিকারী। আর এই কল্পনা বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে বাস্তবের রূপ-রস-গন্ধে নিজেকে জারিয়ে তুলে তিনি কল্পনা কে হাতিয়ার করে ভাবরসে ডুবে গিয়ে কাব্যের সৃষ্টি করেছেন। তাইতো তাঁর শান্ত স্থির দৃষ্টি চোখের আড়ালে এক অভিজ্ঞ প্রাজ্ঞ চোখ দেখতে পারি আমরা। ইন্দ্রিয়লব্ধ যে উপলব্ধি তাকে কবি কিছুতেই এড়াতে পারেন নি, একজন বাস্তব সচেতন ব্যক্তির ক্ষেত্রে তা তো এড়ানো সম্ভবত নয় । তাইতো তাঁর অনুভবে ধরা পড়তে দেখি--

"অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ
যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশী আজ চোখে দেখে তারা;
যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই-প্রীতি নেই। করুণার
আলোড়ন নেই পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।"[১৬]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের যে বীভৎসতার সাক্ষী কবি জীবনানন্দ হয়েছিলেন, ফলে তাঁর মনে জেগে উঠেছিল সংশয়, বিষণ্ণতা, যার থেকে এসেছিল একাত্মবোধ, ফলত এই তীব্র আকাঙ্ক্ষায় এই সকল বিষয়কে পার করে তিনি সত্য সন্ধানে ঘুরে বেড়িয়েছেন, কিন্তু সে সত্যের খোঁজ পুরোপুরি জীবনানন্দ পান-নি, তার ফলে এক সর্বগ্রাসী দুঃখবোধ তাঁকে পীড়িতকরে এজন্যই তাঁর কবিতায় এত বিষণ্ণতা, এত মৃত্যু এত অন্ধকার। তিনি আধুনিক যুগযন্ত্রণা অনুভব করেছিলেন বলেই, ভরসা রেখেছিলেন এ সকল বিষণ্ণতা কেটে যাবে প্রচন্ড আশাবাদী উত্তরণে--'মানুষের ক্রম মুক্তি হবে'। যুগসচেতন কবি জীবনানন্দ সমাজের অবক্ষয়িত রূপ দেখে ব্যাথিত হয়েছেন। সেই ব্যাথা থেকে এসেছে বিস্ময়, এই বিস্ময় থেকে এসেছে অন্ধকার। আর এই অন্ধকারের রং ধূসর। ধূসর এবং অন্ধকার মৃত্যুকেই প্রতীকি করেছে। এই মৃত্যুচিন্তা প্রায় প্রত্যেকটি কবিতায় এসেছে ভিন্ন ভাবে 'পিরামিড' কবিতায় কবি বলছেন ---

"নিত্য নব দিবসের মৃত্যুঘন্টা বাজে,
শতাব্দীর শবদেহে শ্মশানের ভস্মবহ্নি জ্বলে;
পান্থ ম্লান চিতার কবলে
একে-একে ডুবে যায় দেশ জাতি সংসার সমাজ।"[১৭]

'অবসরের গান' কবিতাতেও রয়েছে সেই মৃত্যুর কথা-মৃতের মাথার স্বপ্ন নড়ে উড়ে অদ্ভুত ইশারা করে পেঁচারা বিকেলের নিশ্চলতা দেখে। 'প্রেম' কবিতায় কবি মৃত্যুর মতন শান্তির প্রত্যাশা করেছেন। 'অন্ধকার' কবিতায় কবি নীলকস্তুরী আভার চাঁদকে বলেছেন -

"হৃদয়ে যে মৃত্যুর শান্তি ও স্থিরতা রয়েছে
রয়েছে যে অঘাত ঘুম
সে আশ্বাদ নষ্ট করবার মতো শেলতীব্রতা তোমার নেই।"[১৮]

আবারও তিনি অন্ধকারের সাথে মৃত্যুর মতো মিশে থেকে ভোরের আলো দেখে পৃথিবীর জীব বলে বুঝতে পেরেছেন। কিন্তু আলো নয় তিনি যেন অন্ধকারকেই ভালোবেসেছেন বেশি তাই তাঁর এমন মৃত্যুর প্রশন্তির প্রতি আকর্ষণ, বারবার তিনি মৃত্যুর সঙ্গে মিশে থাকতে চেয়েছেন। 'মৃত্যুর আগে' কবিতায় ও এসেছে মুত্যুচিন্তা, সেখানে প্রকৃতি প্রেম আর এক সীমারেখায় এসে উপনীত হয়েছে। মৃত্যুর আগে তাইতো -

"সব রাঙ্গা কামনার শিয়রে যে দেয়ালের মতো এসে জাগে
ধূসর মৃত্যুর মুখ;"[১৯]

'শিকার' কবিতায় ও মৃত্যু এসেছে– 'নিঃস্পন্দ নিরপরাধ ঘুম' – এর মধ্যে দিয়ে। 'আটবছর আগের একদিন' কবিতায় কবি নাটকীয় ভঙ্গিমায় মৃত্যুর কথা বলেছেন, একজন ব্যক্তির জীবনের উপভোগের সকল উপাদান থাকা সত্ত্বেও তিনি একগাছা দড়ি হাতে অশ্বত্থের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। পঞ্চমীর চাঁদ যখন ডুবে যাচ্ছে তখন সেই ব্যক্তির মরিবার সাধ হল, মারা যাবার কারণ সরূপ কবি জানাচ্ছেন -

"জীবনের এই স্বাদ-সুপক্ক যবের ঘ্রাণ হেমন্তের বিকালের
তোমার অসহ্য বোধ হলো;
মর্গে কি হৃদয় জুড়ালো
মর্গে -গুমোটে
খ্যাঁতা ইঁদুরের মতো রক্তমাখা ঠোঁটে।"[২০]

এছাড়া সেই ব্যক্তিটি জেনে ছিলো যে জীবন ফড়িঙের, দোয়েলের মানুষের সঙ্গে সেই জীবনের কোনো মিল নেই, মিল থাকেনি কোনোদিন। আর থাকবেও না, এই ভেবে সে মৃত্যুর মধ্যে সুখ খুঁজতে চেয়েছে, বর্তমান সমাজের অবক্ষয় তাঁকে সুখী করতো পাতছেনা তাই মৃত্যু তাঁর কাছে এত মধুর। জীবনানন্দের কাছেও মৃত্যু প্রশান্তি নিয়ে আসে যেন, জীবনের এতরকম কালো দেখে তিনি শান্তি পেতে চেয়েছেন বারবার মৃত্যুর কাছে। ত্রিশের করিদের মধ্যে জীবনানন্দের কবিতাতেই মৃত্যুচিন্ত। এত বিস্তৃত গভীর ভাবে ধরা দিয়েছে। তাঁর মৃত্যুচিন্তা তাঁর বাস্তবচিন্তারই একটি অংশ।

জীবনানন্দের কবিতায় অন্ধকারের প্রসঙ্গ যেন মৃত্যু চেতনার মতোই একটি গভীর ভাবব্যঞ্জনার দ্যোতনা করেছে। অন্ধকারেই যেন তিনি থাকতে ভালোবাসেন। তাই তার প্রায় প্রত্যেকটি কবিতাতেই বারবার অন্ধকারের প্রসঙ্গের উত্থাপন করেছেন, তার কারণ বোধহয়, তিনি যে সময়ে দাঁড়িয়ে কবিতা লিখছেন সে সময়কার পরাধীন দেশ, বিশ্বযুদ্ধ মন্বন্তর, মহামারি, ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন, কর্মজীবনে ব্যর্থতা এত কিছু হয়েছে, সেইসব কালোর ছাপ যেন তার অন্ধকার শব্দকেই প্রতিনিধিত্ব করেছে বারংবার। তিনি এই অন্ধকারে হেঁটে ক্লান্ত হয়েছেন তা থেকে বেড়োনোর চেষ্টাও করেছেন নিজের মতো করে। শান্তি প্রার্থনা করেছেন। বনলতা, সুচেতনা, সুরঞ্জনার কাছে, ঈশ্বরের কাছে নয়। 'অন্ধকার' কবিতায় তিনি বলেছেন -

"হৃদয়ের অবিরল অন্ধকারের ভিতর সূর্য কে ডুবিয়ে ফেলে
আবার ঘুমাতে চেয়েছি আমি,
অন্ধকারের স্তনের ভিতর যোনির ভিতর অনন্ত মৃত্যুর মত মিশে
থাকতে চেয়েছি।"[২১]

'রাত্রি' কবিতায় আমরা অন্ধকারের আর একটি রূপ দেখি সেখানে দুপুর রাতে মোটরকার গারলের মতো কেশে যায় এবং –

"হাইড্র্যান্ট খুলে দিয়ে কুষ্টরোগী চেটে নেয় জল;
অথবা সে-হাইড্র্যান্ট হয়তো বা গিয়েছিল ফেঁসে।"[২২]

এখানেই নগরীর মহৎ রাত্রিকে জীবনানন্দের লিবিয়ার জঙ্গলের মত মনে হয়। অন্ধকারের এক নারকীয় বীভৎসতা রয়েছে যা দেখে আমরা আঁতকে উঠতে বাধ্য হয় একজন কুষ্ঠরোগীর হাইড্র্যান্ট খুলে জল পান করার দৃশ্যে।

এছাড়াও 'সিন্ধুসারস' কবিতায়ও অন্ধকার এসেছে সেখানে – গৃধিনীর অন্ধকার গান যা শৈলের গহ্বর থেকে পৃথিবীর অন্ধকার তরঙ্গের আহ্বান করছে, সৌন্দর্য হাতে রাখছে অন্ধকার ক্ষুধার বিবরে।

জীবনানন্দ গভীর বিস্ময়ে যখন চারিদিকে দেখছেন তখন তিনি উপলব্ধি করলেন তিনি আর সহজ লোকের মতো চলতে পারছেন না। কারণ তাঁর স্বপ্ন নেই, শান্তি পাচ্ছেন না, সকল সময় একটি বোধ তকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে - এর থেকে তিনি নিজের অস্তিত্বের সংকটে ভুগেছেন, যার সুর তাঁর বিভিন্ন কবিতায় ঘুরে ফিরে এসেছে বারবার –

"কোথাও সান্ত্বনা নেই পৃথিবীতে আজ;
বহুদিন থেকে শান্তি নেই।
নীড় নেই
পাখিরো মতন কোনো হৃদয়ের তরে পাখি নেই।"[২৩]

মানুষের মধ্যে সেই মানবসত্ত্বা, সেই আত্মীয়তা তিনি আর লক্ষ্য করতে পারছেন না, রাজনীতি, সমাজ, অর্থনৈতিক চাপে মানুষ বাঁচার স্বাদ পাচ্ছেন না, হাফিয়ে উঠছে ক্রমাগত আধুনিক যান্ত্রিক যুগে -

"চারিদিকে অগনন মেশিন ও মেশিনের দেবতার কাছে
নিজেকে স্বাধীন বলে মনে করে নিতে গিয়ে তবু
মানুষ এখনও বিশৃঙ্খল।"[২৪]

বিশৃঙ্খল পরিবেশে কবি টিকে থাকার লড়ায়ে যেন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন, নদী ও নতুন ভাবে সেজে ওঠে যেখানে, সেখানে 'মানুষ অস্তিত্বের সংকটে ভুগছে পৃথিবীতে কোনো স্বচ্ছতা নেই, পৃথিবীতে আজ তাই ---

"যে মানুষ - যেই দেশ টিঁকে থাকে সে-ই
ব্যক্তি হয়-রাজ্য গড়ে - সাম্রাজ্যের মতো কোনো ভূমা চায়।"[২৫]

এই সংকটের কালে সমাজে অবক্ষয় সৃষ্টি হয়েছে, তাই যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি তারাই চোখে দেখছে, যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই, প্রীতি নেই, করুনা নেই পৃথিবী অবল হয়ে গেছে তাদের সুপরামর্শ ছাড়া কারণ পৃথিবীর গভীর থেকেও । গভীর অসুখ। এই অসুখ -ই দাঙ্গা সৃষ্টি করছে আর এই দাঙ্গার পরিবেশে--

"মানুষকে মানুষের মত ভালোবাসা দিতে গিয়ে তবু
দেখেছি আমারই হাতে নিহত
ভাইবোন বন্ধু পরিজন পড়ে আছে।"[২৬]

'হায় চিল' কবিতায় এই অস্তিত্বের সংকটে টিকে থাকবার জন্যই তাকে কেঁদে কেঁদে উড়ে খাবার যোগার করতে যেতে হয়। 'শিকার' কবিতায় হরিণটি টিঁকে থাকার জন্য সারারাত জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে শিকারীর হাত থেকে পালিয়ে পালিয়ে ভোরের অপেক্ষায়। এত কিছু দেখে কবি জীবনানন্দ দাশ স্তব্ধ হয়ে গেছেন বিস্ময়ে, তারই নিজের মুদ্রাদোষে তিনি আলাদা হয়ে গেছেন তাই তাঁর চোখেই ধাঁধা তাঁর পথেই বাধা শুধু।

জীবনানন্দের কবিতায় যতি চিহ্নের ব্যবহার এক ভিন্ন অর্থের দোতনা করে, তাঁর আগে বাংলা কবিতায় যতি চিহ্নের এমন ব্যবহার কেউ করেননি, তাঁর কবিতায় ড্যাশের ব্যবহার শব্দ প্রয়োগের মতোই অর্থ প্রকাশ করে। যেমন -

ক "ধানসিড়ি নদীর কিনারে আমি শুয়েছিলাম - পউষের রাতে (অন্ধকার)।
খ. সুচেতনা, এই পথে আলো জ্বেলে – এ পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে; (সুচেতনা)।

রঙের ব্যবহার জীবনানন্দের কবিতার প্রাণ বলা যেতে পারে, প্রত্যেকটি কবিতায় তিনি নানান রঙের প্রসঙ্গ এনে ভাষাকে, ভাবনাকে সতেজ করে তুলেছেন। সাদা কালো রঙের প্রতি তার টান ছিলো বেশি, ধূসর রঙ তাঁর প্রিয়, তাইতো তার কাব্যগ্রন্থের নাম ধূসর পাণ্ডুলিপি, এ এছাড়া, সবুজ, হলুদ, কমলা, লাল, নীল রঙের ব্যবহার চোখে পড়ে।

কবিতার ভাবনায়, কিংবা বিষয় নির্বাচনে যে স্বাতন্ত্র্যতা দেখিয়েছেন জীবনানন্দ সেক্ষেত্রে তিনি চিন্তা- ভাবনায় আধুনিকতার ছাপ রেখেছেন, তেমনি কবিতা পরিবেশনের ক্ষেত্রেও তাঁর স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বার ছাপ চোখে পড়ার মতোই।

কবিতায় ছন্দ প্রয়োগের বৈচিত্র্যতা এনেছেন তিনি। কবিতার ক্ষেত্রে অন্তমিল রাখেননি। কিন্তু তাতে তাঁর কবিতার ছন্দের ব্যবহার দুর্বল হয়ে পড়েনি কিছুতেই তাঁর কবিতার যে স্নিগ্ধতা, নির্জনতা তা ছন্দে এনে দিয়েছে এক প্রবাহমান গতি। জীবনানন্দের কবিতার ছন্দ বিশেষত ধীরলয়েরই বেশি, কবিতায় বিশেষক্ষেত্রে মিশ্রবৃত্ত রীতিতেই বেশি লিখেছেন, মিশ্রবৃত্তরীতির পয়ার মহাপয়ার সৃষ্টিতে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এছাড়া গদ্যছন্দেও তিনি সিদ্ধহস্ত। তাঁর 'রূপসী বাংলার কবিতাগুলিতে মহাপয়ার এবং 'বনলতাসেনে'র – 'সুচেতনা', 'বনলতাসেন' কবিতাতে মিশ্র বৃত্তরীতির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

'হাওয়ার রাত' কবিতায় - গদ্যছন্দের ব্যবহার রয়েছে। বিশেষত পরায়ের ক্ষেত্রেই কবির বিশেষ দুর্বলতা লক্ষ্য করা যায় এবং তা মিশ্র রীতির পরার। তাঁর কবিতার ছন্দে নিজস্বতা এসেছে ভাব অনুযারী, কবিতার লাইনগুলি দীর্ঘ হলেও ছন্দের ক্ষেত্রে কোথাও রসবোধের হানি ঘটাননি।

উপমার সাহায্যে বাংলার চিরাচরিত কঠিন বাস্তবকে জীবনানন্দ সাবলীল ভাবে তুলে ধরেছেন তাঁর বেশ কিছু কবিতায়। সংস্কৃত সাহিত্য 'উপমা কালিদাসস্য'- বলে একটি প্রবাদ শুনতে পাওয়া যায় সেই সুরেই আমরা বলতেই পারি জীবনানন্দের কবিতা যেন জীবন্ত উপমার খনি। যে খনিতে প্রবেশ করলে মণি-মুক্তোর মত উপমার ব্যবহার লক্ষ্য করতে পারি। জীবনানন্দের মনে হয়েছিল- সকলকেই কবি বলা যায় না, কাউকে কাউকে আমরা কবি বলতে পারি - তার কারণ তিনি বোঝাতে চেয়েছেন কবি হওয়া সহজ নয়, তার জন্য, সাধনা, ধ্যান, প্রগাঢ় জীবনদর্শন, সর্বোপরি দূরদৃষ্ট ভাবুক সহৃদয় হতে হয়, ত্যাগী হয়ে চোখ কান সজাগ রেখে চলতে হয়। এই চোখ-কান পঞ্চ ইন্দ্রিয়কেই সজাগ রেখে কবিতা লিখেছিলেন জীবনানন্দ। এই কেউ কেউ কবির দলে জীবনালন্দ এক অনন্য ব্যক্তিত্ববোধের কবি, উপমা প্রয়োগে তাঁর যেন সিদ্ধহস্ত, উপমাগুলি তিনি ব্যবহার করেছেন প্রকৃতির রূপের থেকেই যেমন--

ক. 'বরফের মতো শাদা ডানা দুটি আকাশের গায়,
ধবল ফেনার মতো নেচে উঠে পৃথিবীরে আনন্দ জানায়'।
খ. 'আকাশের রঙ ঘাস ফড়িঙের দেহের মতো কোমল নীল;
গ. বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ মনে আসে'।

জীবনানন্দ তাঁর কবিতাতে নানান টেকনিকের পাশাপাশি বিভিন্নধর্মী চিত্র কল্পের মাধ্যমে এক অনাবীল সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে এক ইন্দ্রিয়লব্ধ পরাবাস্তবের স্বাদ এনেছেন পাঠককে। চিত্রকল্পের জন্য জীবনানন্দের লেখা পড়ে পাঠক এক সহজাত অনুভূতিলোকে হারিয়ে এক সুদূর আনন্দের রস উপভোগ করে থাকেন। চিত্রকল্প ব্যবহারে সজীব জীবনানন্দ আমরা বলতেই পারি 'শিকার' কবিতায় কবি আধুনিক মানুষের হিংস্রতা ও বর্বরতা, আদিমতা বোঝাবার জন্য বলছেন --

"একটি আদ্ভুত শব্দ।
নদীর জল মচকাফুলের পাপড়ির মতো লাল।
আগুন জ্বললো আবার – উষ্ণলাল হরিণের মাংস তৈরি হয়ে এলো।

নক্ষেত্রের নিচে ঘাসের বিছানায় বসে অনেক পুরানো শিশির ভেজা গল্প সিগারেটের ধোঁয়া;
টেরিকাটা কয়েকটি মানুষের মাথা;
এলোমেলো কয়েকটি বন্দুক–হিম–নিঃস্পন্দ নিরপরাধ ঘুম।"[২৭]

'রাত্রি' কবিতায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের নারকীয়তা, বীভৎসতা, শহরের কদর্য ও ঘৃণ্য রূপ তুলে ধরেছেন এবং একজন কুষ্ঠরোগীর অসহায়তা বোঝাবার জন্য লিখছেন--

"হাইড্রান্ট খুলে দিয়ে কুষ্টরোগী চেটে নেয় জল;
অথবা সে - হাইড্রান্ট হয়তো বা গিয়েছিল ফেঁসে।
একটি মোটরকার গাড়লের মতো গেল কেশে অস্থির পেট্রল ঝেড়ে।"[২৮]

'আটবছর আগে একদিন' কবিতায় নির্জন পরিবেশের ভয়াভয়তা ও আতঙ্ক সৃষ্টি করতে, কুচ্ছিত একটি পরিবেশ বোঝাতে 'উটের গ্রীবা' কে নিয়ে এসেছেন। চিত্রকল্প হল একধরনের স্মৃতি ছবি যা শব্দ দিয়ে গড়ে তোলা হয়, কবি বলবেন একটি কথা আর আমাদের মনে ভেসে উঠবে একটি ছবি, একটি অনুভব স্মৃতি, সেই অনুভব স্মৃতির সঙ্গে আমরা জীবনানন্দের কবিতায় পূর্বেই পরিচিত হয়েছি। জীবনানন্দ চিত্রকল্পের এক বিরাট সম্ভার আমাদের উপহার দিয়েছেন তাই তাঁর কবিতা পাঠে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি সচেতন হয়ে ওঠে।

আমাদের বর্তমান জীবনে জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রভাব বিশেষ ভাবে রয়েছে। এই প্রভাব প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে, বিভিন্ন কবি লেখকদের লেখায় এই জ্যোতিষ শাস্ত্রের নিয়তিবাদ রাশিচক্র গ্রহের দোষ ইত্যাদি প্রসঙ্গে দেখা গেছে তার থেকে জীবনানন্দও বাদ পড়েননি, তিনি বাস্তবের এই নিয়তিবাদ, রাশিচক্র মানতেন বলেই হয়তো তাঁর 'গাধূলি সন্ধির নৃত্য' (সাতটি তারার তিমির) কবিতায় চারটি রাশির ব্যবহার আমরা দেখতে পাই। 'পায়ের ভঙ্গির নিচে বৃশ্চিক কর্কট-তুলা-মীন', রাশিচক্রের মধ্যে বৃশ্চিক রাশি অষ্টমে অবস্থান এবং এই রাশির ব্যক্তিরা সাধারণত স্বাধীন, দূরদর্শী হয়ে থাকেন। 'কর্কট'-চতুর্থ অবস্থানে, এরা ঝামেলা পছন্দ করেন না, কল্পনাপ্রবণ। 'তুলা' - সপ্তম অবস্থানে, - এরা যেকোন পরিস্থিতিতে শান্ত থাকে। 'মীন'-দ্বাদশ অর্থাৎ মেষ ব্যুশি এরা পরোপকারী বলে আমরা মনে করি জ্যোতিসশাস্ত্র অনুযায়ী। — এই চারটি রাশি রয়েছে পায়ের ভঙ্গির নীচে, অর্থাৎ 'নিয়তি পদদলিত'।

এর থেকে অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে, জীবনানন্দ যে সময়ে দাঁড়িয়ে কবিতাটি লিখেছেন তখন রাজনীতির চাপে সাধারণ থেকে জ্ঞানী তাদের জীবন তৎকালীন বিশ্বযুদ্ধের বা রাজনৈতিক চাপে পদদলিত হয়ে যেতে বসেছিল। তাই নাকি তাঁর কলমে এহেন প্রসঙ্গের উত্থাপন করেছেন।

আর একটি দিক দিয়ে যদি আমরা ভাবি আমরা যদি উল্লিখিত চারটি রাশির চিহ্ন খেয়াল করি তাহলে দেখব 'বৃশ্চিক' ও কর্কট হিংস্র, বিষাক্ত জীব, এদের কামড়ে মানুষকে যন্ত্রণা দেয়, এরপরেই আসছে 'তুলা' অর্থাৎ দুদিকেই সমান করছে, এরপর 'মীন' কে আনলেন অর্থাৎ একটা শান্ত ভাব, যারা উপকার করে, 'মীন' অর্থাৎ মৎস, এরা জলে থাকে, হিংস্র নয়, এদের খেয়ে আমরা পুষ্টি লাভ করি, এরা উপকারে আসে আমাদের।

সুতরাং, সমাজের কিছু 'বৃশ্চিক' ও 'কর্কটের-মতন ব্যক্তি রয়েছে এবং কিছু মীনের মতন মানুষ রয়েছে তাদের মাঝে তুলা-কে আনলেন। তুলা এই দুই বৈষম্য জাতির মধ্যে সমতা বিধানের চেষ্টা করছে।

এছাড়া 'বোধ' কবিতায় কবির প্রেমের পথে বাধা দিয়েছে সেই 'নক্ষত্র' এবং 'নক্ষত্রের দোষ'। এখানেও তিনি জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রসঙ্গ এনেছেন। এহেন ভাবনা যে জীবনানন্দ ছাড়া অন্য কারোর হতে পারে না তা বলাইবাহুল্য।

বাংলা কাব্যের মোড় ঘুরিয়ে দেবার অভিসন্ধি নিয়ে যারা জ্ঞানেবোদ্ধা হয়ে ভাবনার সাগরে নিজেকে ডুবিয়ে লেখনী ধারণ করলেন তাদের মধ্যে জীবনানন্দ যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব তা আমরা পূর্বেই বুঝে নিয়েছি। সমস্ত চেতনা,

সমস্ত সত্ত্বা দিয়ে তিনি সমগ্র পৃথিবী এবং ব্যক্তিবোধের সামঞ্জস্য করতে চেয়েছিলেন, কখনও আত্মার গভীরে বা দেশকালের সত্ত্বার মধ্যে এমন নিবিষ্ট মনে হেঁটে চলেছেন যেন হেঁটে চলাতেই তাঁর মুগ্ধতা। এতেই তাঁর আনন্দ এজন্য জীবনানন্দকে চিরপথিক মনে হয় ধরে আমাদের। তিনি এমন এক অধরার সন্ধানে হেঁটেছেন হাজার বছর ধরে, যার হদিশ পাওয়া আমাদের সাধ্যের বাইরে।

বেদনার বিষণ্ণতায় ডুবে থাকা কবি জীবনানন্দ, জীবনকে যে বিশেষ চোখে দেখেছেন, বা দেখতে চেয়েছেন সেই দেখার সঙ্গে পরিচয় হলে আমরা দেখতে পারি, জগত ও জীবনের, দেশ ও কালের মধ্যে মগ্ন থেকেও তিনি যে একটি মায়াময় অলৌকিক ভাবনার রাজ্যে ছিলেন বা পাঠককে নিয়ে যেতে চান তার সেই ভাবনার জগতে আমরা পঞ্চেন্দ্রিয়ের পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়েও হয়তো সেই মননরাজ্যে উপনীত হবার শক্তি আমাদের নেই। এ জন্যই হয়তো জীবনানন্দ আমাদের কাছে অধরা, ধরতে পেরেও যেন স্পর্শ করতে পারি না। বলতে দ্বিধা নেই –

"শতাব্দীর সেই রাক্ষসী বেলায় অস্তিত্বের অন্তরালে
'কেন' এবং 'কী নিয়ে বেঁচে আছি' এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে
খুঁজে শেষ পর্যন্ত নিরাশা পীড়িত সংশয়ের বোঝা কাঁধে নিয়েই
তাকে যেতে হয়েছিল হয়তো।"[২৯]

একটি মানুষ তাঁর ভাবনার জগত নিয়ে কতটা ডুকে থাকলে তাকে ধ্যানী কবি বলতে পারি, জীবনানন্দ-কে পড়লে আমরা তা অস্থি মস্থায় উপলব্ধি করতে পারি সে বিষয়টি। ভাবনার এমন বহিঃপ্রাকাশ, চিন্তনের এমন ছবি যা দেখে রীতিমতো আশ্চর্য হতে হয়, আমরা জীবনানন্দের কবিতা পড়ে শিহড়িত হয় রীতিমতো, আমাদের চিত্তে একটি আলোড়ন উদ্দিপিত হয়, আমাদের মস্তিকে বোধের চিন্তা একটি অন্য জগতে প্রবেশ করায়। আপনভোলা কবি জীবনানন্দ নির্জনতায় থেকে, একাকিত্বের পাঠ গভীর ভাবে বুঝে লেখনী ধারণ করেছিলেন বলেই তা এমন বাস্তব সদৃশ ওকালের বুকে তা ভাস্মর এবং আধুনিক যুগেও এতটা প্রাসঙ্গিক।

তথ্যসূত্র :

১. বসু, বুদ্ধদেব, 'কালের পুতুল' (জীবনানন্দ দাশ এর স্মরণে) নিউ এজ পাবলিশার্স, চতুর্থ সংস্করণ বৈশাখ ১৪১৭, মে ২০১০, পৃ. ৩৯
২. দাশ, জীবনানন্দ, 'কবিতায় আত্মা শরীর' পৃ. ৪৫
৩. দাশ, জীবনানন্দ, 'নির্জন স্বাক্ষর' (জীবনানন্দ দাশ এর শ্রেষ্ট কবিতা), লতিকা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশঃ শুভ নববর্ষ ১৪২২, পৃ. ২১
৪. বসু, বুদ্ধদেব, 'কালের পুতুল' (জীবনানন্দ দাশ এর স্মরণে) নিউ এজ পাবলিশার্স, চতুর্থ সংস্করণ বৈশাখ ১৪১৭, মে ২০১০, পৃ. ৪৫-৪৬
৫. দাশ, জীবনানন্দ, 'বোধ' (জীবনানন্দ দাশ এর স্মরণে), লতিকা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, শুভ নববর্ষ, ১৪২২, পৃ. ১৬ - ১৭
৬. ঐ, পৃ. ১৮
৭. ঐ, 'আট বছর আগের একদিন' পৃ. ৭৫
৮. ঐ, পৃ. ৭৪
৯. বসু বুদ্ধদেব, 'কালের পুতুল' (জীবনানন্দ দাশ এর স্মরণে) নিউ এজ পাবলিশার্স, চতুর্থ সংস্করণ, বৈশাখ ১৪১৭, মে ২০১০, পৃ. ৫৪

১০. ঐ, পৃ. ৫৫
১১. ঐ, পৃ. ৫৬
১২. দাশ, জীবনানন্দ, 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি' (জীবনানন্দ দাশ এর শ্রেষ্ঠ কবিতা), লতিকা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, শুভ নববর্ষ ১৪২২, পৃ. ৪৩
১৩. ঐ
১৪. ঐ, 'আবার আসিব ফিরে' পৃ. ৪৪
১৫. বসু, বুদ্ধদেব, 'কালের পুতুল' (জীবনানন্দ দাশ : ধুসর পাণ্ডুলিপি) নিউ এজ পাবলিশার্স, চতুর্থ সংকল্প, পৃ. ২৭
১৬. দাশ জীবনানন্দ, 'অদ্ভুত আঁধার এক' (১২ নং দ্রষ্টব্য) পৃ. ১৪৩
১৭. ঐ, 'পিরামিড', পৃ. ১০
১৮. ঐ, 'অন্ধকার', পৃ. ৫১
১৯. ঐ, 'মৃত্যুর আগে', পৃ. ১৬
২০. ঐ, 'আট বছর আগের একদিন', পৃ. ৭৪
২১. ঐ, 'অন্ধকার', পৃ. ৫১
২২. ঐ, 'রাত্রি', পৃ. ৯১
২৩. ঐ 'জনান্তিকে', পৃ. ১০৪
২৪. ঐ
২৫. ঐ
২৬. ঐ, 'সুচেতন', পৃ. ৫৫
২৭. ঐ, 'শিকার', পৃ. ৭০ – ৭১
২৮. ঐ, 'রাত্রি', পৃ. ৯১
২৯. চক্রবর্তী, সুমিতা, 'জীবনানন্দ সমাজ ও সমকাল', সাহিত্য লোক, নতুন সংস্করণ, ১ বৈশাখ ১৪২৩, ১৪ এপ্রিল ২০১৬, পৃ. ৩৭